অবকাশ

কেমন লাগছে 'অবকাশ'? জানান আপনাদের মতামত। থাকে যদি কিছু পরামর্শ, তাও জানান। সানন্দে গ্রহণ করব আমরা।
আরও কিছু জানতে বা জানাতে এবং লেখা পাঠাতে-ঃ -
মোবাইল ৯৫৬৪০৬৫৫৫৫ অথবা ই-মেল lipiarambagh@gmail.com
যে ঠিকানায় লেখা পাঠাবেন -
দেবাংশু চক্রবর্তী, আর্থিক লিপি, ওয়ার্ড নং ৪, কোর্ট পাড়া, পোঃ-আরামবাগ, জেলা ঃ হুগলি, পিন-ঃ ৭১২৬০১

একমুঠো মাটি

শুভদীপ চক্রবর্তী

মাঘ মাসের হিমেল হাওয়ায় কাঁথা কম্বল মুড়ি দিয়ে এক অনিশ্চিত শীতঘুমে গেছে সকল স্বতঃস্ফূর্ততা। সাহিত্যের মারপ্যাঁচে যতটা করুণাবস্থা ব্যাখ্যা করা সম্ভব, তার চেয়েও কঠোরতর জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়েছিল বরাইডাঙা গ্রামের আট থেকে আশি সকলেই। অভ্যস্ত হয়েছিল বললে ভুল হবে, অভ্যস্ত হতে বাধ্য করা হয়েছিল। মাঠ ভরা শস্য, গোয়ালে গোরুর পাল, তিস্তার কাচের মতো স্বচ্ছ জলে রংবাহারি মাছ— সবই ছিল পর্যাপ্ত। আসলে জীবনধারণের লড়াইটা তাদের ওপরমহলের সাথে। পর্যটনের এক স্বর্গরাজ্য বরাইডাঙা। তা দখলের দাবিতে একদল লোক থেকে থেকেই ভীষণভাবে নির্যাতন করত মানষগুলোকে। উঠতি বয়সি মেয়েদের বাইরে বেরোনো ছিল কল্পনাতীত। গ্রামের লোকেরা ছিল সাদাসিধে প্রকৃতির, কখনই ক্ষমতাশালী মানুষগুলোর প্রতি তেমনভাবে জেহাদ ঘোষণা করতে পারেনি, তবে মনের মাঝে দিনের পর দিন সঞ্চয় ঘটেছিল এক অদম্য প্রতিহিংসার। গ্রামের যুবকদের রক্ত গরম--- সেই উষ্ণতার বশবর্তী হয়েই কেউ কেউ প্রতিবাদের সুর তুলেছিল বটে, তবে তা সার্থকতা পায়নি কোনোদিনই— অকালমৃত্যু ঘটেছে বহু সতেজ প্রাণের।

হৃদয়বিদারক কান্নার সুর সকাল সন্ধে দাপিয়ে বেরাতো গোটা গ্রাম। ধীরে ধীরে বিদ্যুত এলো, বাতি এলো, গ্রামবাসীর মনেও এলো জাগরণের ডাক। বোশিখ চাচা, রমেন গোঁসাই, তারক, মইনুল সবাই মিলে একজোট হয়ে তীব্র প্রতিবাদে সামিল হয়েছিল, ভয় পেয়েছিল মানুষরূপী পিশাচের দল। বেশ কিছুদিন তাদের টিকিটিরও দেখা মেলেনি বরাইডাঙার ত্রি-সীমানায়। তবে ঝড় আগমনের পূর্বে স্তব্ধতাকেই পাঠায় দূত হিসেবে। তাই সকল স্বব্ধতার অবসান ঘটিয়ে ঝড় এসেছিল— আধুনিক লোকগুলো অত্যাধুনিক সব হাতিয়ার নিয়ে অবলীলায় পরাজয় ঘটাচ্ছিল গ্রামবাসীদের। তারা ভালোই বুঝতে পেরেছিল ক্ষমতার জোরে ওপরমহলের সাথে পেরে ওঠা অসম্ভব, তাদের তেমনভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতাও নেই, নেই আধুনিকতার ছোঁয়া। তবে বাপ-ঠাকুরদার মাটি ছেড়ে চলে যাওয়ার থেকে মৃত্যুবরণ অনেক বেশি শ্রেয় বলে বিবেচিত হয়েছিল এই মাটির মানুষগুলোর কাছে। অত্যাচার দিন দিন বেড়েই চলেছিল। প্রতিটি দিন তাদের কাছে ছিল বিভীষিকাময়, প্রত্যহ চলত টিকে থাকার এক অসম লড়াই। গ্রামবাসীদের জব্দ করার জন্য মাঝেমধ্যেই তারা গায়েব করে দিত অতিযত্নে পালিত হাঁস, মুরগি, গোরু, ধানের খেতে আগুন জ্বালাতো প্রায়শই। অসহায় মানুষগুলো অনাহারেও ভুগেছিল বেশ কিছুদিন। গ্রামের উত্তরে, তিস্তার ধার ঘেঁষে এক নির্জন স্থানে অনেকগুলো বড়ো মাপের গর্ত বানিয়েছিল তারা, যেখানে বিপদকালে গোরু, ছাগল ইত্যাদিকে লুকিয়ে রাখা হত। একবার শহুরে মানুষগুলো আইনের ভয় দেখায় তাদের, মস্ত গাড়িতে করে নিয়ে আসে এক আই পি এস অফিসারকে, নাম অভিরূপ পট্টনায়ক। যতদূর ধারণা করা যায় লোকটি উড়িয়া, শ্যামবর্ণ, উচ্চতর দেহ, কোঁকড়ানো চুল, চোখে হিংস্রতার লেশমাত্র নেই। লোকগুলো চেঁচিয়ে বলেছিল— "শেষবারের মতো বলছি, গ্রামটা ছেড়ে দাও। তোমাদের প্রচুর টাকা দেবো আমরা, তা দিয়ে শহরে কিছু করো গিয়ে।'

প্রত্যুত্তরে তারা জানায়--- 'টাকার গন্ধ আমরা চিনি না, বুঝি না, বুঝতে চাইও না... আমরা মাটির গন্ধ চিনি। যতক্ষণ প্রাণ আছে, বাপের ভিটে আমরা ছাড়ব না।

মানুষগুলোর এহেন মানসিকতা আর সাহস দেখে খানিক অবাক হয়েছিলেন অভিরূপবাবু। তাদের সাথে একটু নিভৃতে কথা বলার জন্যই হয়তো নিজ সহযোগীদের বলেছিলেন ফিরে যেতে, বলেছিলেন--- 'তোমরা নিশ্চিন্তে যাও, আমি ব্যাপারটা খতিয়ে দেখছি।'

অনেকক্ষণ বরাইডাঙার বাসিন্দাদের সাথে কথা বলেছিলেন তিনি, বুঝেছিলেন লোকগুলোর আন্তরিকতা অপরিসীম— শত্রুপক্ষ হয়েও তাদের এহেন ব্যবহার অপ্রত্যাশিত। ভূমি দখলের কোনো প্রসঙ্গ তিনি তোলেননি— বরং নিজ চালচলনে বারংবার সাধুবাদ জানিয়েছেন গ্রামবাসীদের প্রচেষ্টাকে, তাদের নিরলস আন্দোলনের ধারাবাহিকতাকে। ফিরে গিয়ে শহুরে ব্যবসায়ীদের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেন তিনি--- 'আমায় কদিন সময় দিন, সব সমূলে তুলে দেবো।'
প্রায় প্রতিদিন গোপনে যেতেন তিনি বরাইডাঙা। লোকগুলোর সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যান ধীরে ধীরে। বোশিখ চাচা প্রবীণ লোক, তার প্রশ্নটিও যুক্তিযুক্ত— 'বাবু, আপনি আমাদের পাশে কেনই বা থাকবেন? আপনার কীসের স্বার্থ? শেষে আপনি যে তীরে এসে তরী ডোবাবেন না তার নিশ্চয়তা কী? 'জন্মস্থান আলাদা হলেও শেকড়ের টান তো এক... মাটির টান তো এক....'

তার কথাগুলোর গভীরতা এতটাই বেশি ছিল, সমস্ত বরাইডাঙা এক মুহূর্তে বিশ্বাস করেছিল লোকটিকে। শুধু তাদের সমর্থন করেই ক্ষান্ত থাকেননি তিনি, বরং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন প্রতিবার। শহরের চেনাজানা কাছের মানুষদের এক এক করে জমায়েত করেছেন বরাইডাঙার বুকে--- উপলক্ষ্য একটাই, দলের আয়তন বৃদ্ধি। কথায় বলে খবর হাওয়ায় ভাসে— তার এই কর্মকাণ্ডও অজ্ঞাত থাকেনি বেশিদিন। কোনো এক গোপন সূত্রে শহরের সেই বিত্তবান ব্যবসায়ীরা জেনে গিয়েছিল সমস্ত ব্যাপারখানা। অভিরূপবাবু খুব ভালোই আন্দাজ করতে পেরেছিলেন এই সকল লোকের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার ফল। টাকা পয়সার জোরে আর তথাকথিত কিছু নেতামন্ত্রী সাহায্যে তার গায়ের খাকি পোশাকটা খুলে দিতে খুব বেশি সময় লাগেনি তাদের, সময় লাগেনি ক্ষমতা কেড়ে আই পি এস অভিরূপ পট্টনায়ককে নিঃস্ব বানাতে। যাওয়ার সময় গ্রামবাসীদের সাথে তাকেও শাসিয়ে যাওয়া হয়। তখন থেকেই, হয়তো নিজের অজান্তেই একটু একটু করে গ্রামের একজন হয়ে উঠেছিলেন তিনি--- শুধু মনোজগতেই নয়, পোষাক-আসাক, আচার- আচরণেও। পুলিশি প্রশিক্ষণে আয়ত্ত করা সকল কৌশল শিখিয়েছিলেন তিনি গ্রামবাসীদের। ধীরে ধীরে বন্দুক চালাতেও পারদর্শী হয়ে ওঠে গোটা বরাইডাঙা। মইনুলের বাড়ি হয়ে ওঠে বোমা তৈরির আড়ত।

প্রায় মাস পাঁচেক পরে আবার মাথাচাড়া দেয় শহুরে দাদাগিরি। অতিকায় সব বুল্ডোজার, মস্ত বড়ো গাড়ি, ব্যাগ ভরা বন্দুক আর হৃদয়ভরা প্রতিহিংসা নিয়ে যেন এক অন্তিম ও নিশ্চিত আঘাত করতে তৈরি তারা। বুল্ডোজার এগোতেই একে ওপরের মুখের দিকে চেয়ে গ্রামবাসীরা একজোট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে দৈত্যসম যন্ত্রের সামনে, দাবি রাখে গ্রাম দখলের পূর্বে তাদেরকে মারতে হবে। লোকগুলো অবাক হয়ে অভিরূপ পট্টনায়ককে দেখে, এই ভূমি বিদ্রোহের তিনিই এক নেতা, তিনিই প্রাণপুরুষ।

সরে যাও, নইলে আমরা গুলি চালাতে বাধ্য হব... ভালোয় ভালোয় গ্রামখানা ছেড়ে দাও।
— গুলি আমরাও চালাতে পারি।

অত্যন্ত বিদ্রুপের সুরেই তারা হাসতে হাসতে বলে— তোমাদের ঐ হাত কোদাল অবধিই সীমিত, গুলি চালাবার জন্য সাহস লাগে... ক্ষমতা লাগে...
সহসাই তারক চেঁচিয়ে বলেছিল— বিপ্লবের মন্ত্র শুনেছেন কোনোদিন? স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন? আমরা প্রত্যহ দেখি। দাসত্ব থেকে মুক্তির নেশায় শুধু বন্দুক নয়, কামানও চালানো যায়।

গোলাগুলি, বোমাবাজি হয়েছিল মাত্রাছাড়া— গভীরভাবে আহত হলেও কারোর প্রাণ যায়নি বটে, তবে গাড়িগুলো জ্বালিয়ে খাক করে দিয়েছিল গ্রামবাসীরা। লোকগুলো বুঝতে পেরেছিল যতদিন অভিরূপ জীবিত, ততদিন এই গ্রাম আত্মসাৎ অসম্ভব।

সেবারেও বিফল হয়ে ফিরেছিল যান্ত্রিক ভূতেরা। অভিরূপ পট্টনায়ক নিজের সঞ্চিত সকল রোজগার ব্যয় করেছিলেন বরাইডাঙায় একটি স্কুল তৈরিতে। গ্রামবাসীরা শিক্ষিত হয়েছিল অনেকাংশে। তাদের হাতে ধরে শহুরে আদবকায়দাও শিখেছিলেন তিনি। সকলের সাথে মিলে স্বপ্ন দেখেছিলেন উপদ্রবহীন বরাইডাঙার।

এর মধ্যেই একদিন ঘটে গেল এক অবাঞ্ছিত ঘটনা — হঠাৎ করেই মৃত্যু হয় বোশিখ চাচার। সারা গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে। অভিরূপবাবুর সান্নিধ্যে খানিকটা আধুনিক হলেও মৃত্যুর কারণ যাচাই করার আদবকায়দায় তারা অবগত ছিল না, কবরে নিদ্রা যান চাচা। গরম লোহায় আঘাত করার এই ছিল সুবর্ণ সুযোগ। শহরের আত্মকেন্দ্রিক মানুষগুলো বোশিখ চাচার শোকাহত পরিবারের কানে বিষ ঢেলে দিয়েছিল, বলেছিল— 'ঐ পট্টানায়ক তোমাদের আব্বাকে গোপনে মেরেছে, কেন জানো? ধীরে ধীরে এই গ্রামে নিজের কব্জা বসতে, তোমাদের গ্রামছাড়া করতে। প্রথমাবস্থায় যদিও তারা বিশ্বাস করেনি, তবে আবেগের বশবর্তী হয়েই খানিক পরে সরল মানুষগুলো বিশ্বাস করে সব। লোকগুলো জানায় কাল তারা আসবে অভিরূপ পট্টনায়কের সকল মুখোশ টেনে খুলতে, তাই এ ব্যাপারে তাকে যাতে কিছু না জানানো হয়। বেশ মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে পরিবারটিকে সাহায্যের নামে একার্থে কিনেই ফেলে তারা। ইতিমধ্যেই কথা পাঁচ কান হয়— শুধু অজানা থাকে অভিরূপ পট্টনায়কের কাছে। শহুরে বর্বরেরা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল শিরদাঁড়া ভেঙে গেছে--- কফিনে শেষ পেরেকটা পোঁতা বাকি। সেই রাতে অনেক গল্প করেছিলেন অভিরূপবাবু, শক্ত গলায় বলেছিলেন--- বুঝলি মইনুল... আমি থাকতে তোদের গ্রামে কেউ থাবা বসাতে পারবে না— কেউ না...

প্রথমবার গ্রামবাসীদের শুকনো মুখ দেখে হয়তো আন্দাজ করেছিলেন কিছু, তবে কোনো প্রশ্ন করেননি। পরেরদিন যথারীতি লোকগুলো আসে। গলার আওয়াজ তুলতেই অভিরূপ পট্টনায়ক উপলব্ধি করেছিলেন তার পাশে আর কেউ নেই, গ্রামবাসীরা চেঁচিয়ে বলছিল--- অভিরূপ পট্টনায়ক বেইমান... আমরা চাই না এমন বেইমান নেতা। কিছু বলার জন্য পিছনে ঘুরতেই একটা গুলি এসে চিরে দেয় পট্টনায়কের দরাজ হৃদয়ের খাঁচা---তাজা রক্তে রক্তিম হয় বরাইডাঙার মাটি— যেই মাটির প্রেমে পাগল ছিলেন তিনি। লুটিয়ে পড়ে তার নিথর দেহ। লোকগুলো বিজয়ী কণ্ঠে তার কাছে এসে বলে--- 'দেখলে তো গুলির শক্তি? একটা গুলিতে এতদিনের কাণ্ডকারখানা সব শেষ...

পরিশিষ্ট অন্তিম কিছু মুহূর্তকে আঁকড়ে ধরে বীর যোদ্ধার মতো অভিরূপ বলেছিলেন--- তোমরা ব্যর্থ... আমি তো কেবল মরতে চলেছি... হারতে বসিনি... খানিক দীর্ঘশ্বাস ফেলে একমুঠো মাটি নিয়ে লোকগুলোকে দেখিয়ে তিনি আবার বলেন— 'এই মাটির তীব্রতা তোমাদের হিংসার চেয়ে অনেক বেশি--- এই একমুঠো মাটিগুলির থেকেও অনেক অনেক বেশি শক্তিশালী... কারণ এতেই ফসল ফলে... এতেই ঘটে অধর্মের বিনাশ... এর রূপেই ছুটে আসে তোমাদের মতো হাজার হাজার কীট... আমি অহংকারী এই মাটিতে মরতে পেরে। মিনিট দুয়েক পরেই চোখ বোজেন তিনি। প্রবল হাওয়ায় আন্দোলিত গাছগুলোর ঝমঝম শব্দে যেন প্রতিফলিত হচ্ছিল অভিরূপ পট্টনায়কের শেষ নিঃশ্বাসের শব্দ। আজ প্রায় আঠারো বছর পরে পর্যটনের এক প্রাণকেন্দ্র হয়েছে বরাইডাঙা। লুপ্ত হয়েছে গ্রামবাসীদের ঘর... এমনকি গ্রামবাসীরাও। বরাইডাঙা শহর হয়েছে আজ। পর্যটকদের গাড়ির আওয়াজ কেড়ে নিয়েছে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। তবুও খামখেয়ালি কোনো যাত্রীর কানে হয়তো আজও ভেসে আসে পট্টনায়কের বীরত্বের গান— হাঁটার পথে মাঝে মধ্যে আজও হয়তো গায়ে শিহরণ জাগায় সেই এক মুঠো মাটির ছোঁয়া।

নাটক ঃ গোপালের উপহার

নাট্য রচনা ঃ দেবাংশু চক্রবর্তী

দৃশ্য -১

(কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ঘর। মহারানী পিছনে দু'হাত দিয়ে কী যেন ভাবছেন আর ঘরময় পায়চারি করছেন। একটু পরেই ঘরে এসে ঢুকলেন মহারাজা। রানীকে পায়চারি করতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন—

রাজা : একী মহারানী! এতো চিন্তা কিসের? কিছু দুর্ঘটনা ঘটল নাকি আবার? তোমার বাবা-মায়ের খবর ভালো তো? কি গো রানী? (একটু জোরে)

রানী : (পায়চারী থামিয়ে) ও তুমি এসে গ্যাছো? দ্যাখো, আমার একটা ইচ্ছে হয়েছে। তোমাকে সেটা করতে দিতেই হবে কিন্তু, না হলে...

রাজা : আহা, বলই না। তোমার কোন ইচ্ছেটা আজ পর্যন্ত আমি মেটাইনি বলো? তুমি কিনা কৃষ্ণনগরের মহারানী। তোমাকে অমান্য করার সাহস আমারও নেই। বলো বলো, বলে ফেলো তোমার ইচ্ছেটা।

রানী : দেখো, আমার না, আমার না...

রাজা : আহা... তোতলা হয়ে গেলে নাকি আবার?

রানী : না না, মানে, এই রাজ্যের সেরা বুদ্ধিমানকে আমি পুরস্কৃত করতে চাই মহারাজ।

রাজা : বাঃ, সে তো খুব ভালো কথা। কিন্তু সেটা করতে গেলে তো একটা প্রতিযোগিতা করার ব্যাপার আছে। দিনক্ষণ ঠিক করার ব্যাপার আছে। তাছাড়া এখন তো রানী জানো, রাজ্যে খরা চলছে। কতদিন বৃষ্টি হয়নি। প্রজাদের এই দুঃখের সময়... এসব প্রতিযোগিতা তারা কি ভালো চোখে দেখবেন?

রানী : না না না (জোরে দিয়ে), অতো প্রতিযোগিতার কোনও ব্যাপারই নেই। শোনো না, আমি আমাদের রাজ্যের সেরা বুদ্ধিমানকে বেছেই রেখেছি।

রাজা : তা কে সে? শুনি।

রানী : কেন? আমাদের গোপাল ভাঁড়।

রাজা : না না রানী, এভাবে একটা পুরস্কার হঠাৎ করে দেওয়া যায় না। এতে অন্যদের রাগ হতে পারে। ভুল ভাবতে পারে। আর তাছাড়া, এটা শুধু কৃষ্ণনগর কেন, নবাব বাহাদুর পর্যন্ত মেনে নিয়েছেন, আমাদের গোপালের বুদ্ধির জুরি মেলা ভার। তার জন্য আবার পুরস্কারের কী দরকার?

রানী : তা জানুক, আমি যখন বলেছি ওকে সেরা বুদ্ধিমান হিসেবে পুরস্কার দেবো, তখন দেবই। আর না দিতে দিলে, আমাকে আমার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দাও। রইল তোমার সাম্রাজ্য।

রাজা : আঃ অ্যাতো রেগে যাচ্ছো কেন রানী? আমি তো জানি যে, গোপাল তোমার খুব প্রিয়। আর তাছাড়া তুমি যখন কোনও কিছু একবার চাইবে, তাকে আটকায় কার সাধ্য? ঠিক আছে, ঠিক আছে। তাই হবে। তবে একটা শর্ত— পুরস্কারটা কী হবে, সেটা কিন্তু আমিই ঠিক করব, (এক চোখ চোখ টিপে, তারপর রানীর দিকে তাকিয়ে) ঠিক আছে?

রানী : সে করতেই পারো তুমি। কিন্তু দেখো, সেটা যেন ওর কাজে আসে, আর ও খুশি হয়।

রাজা : ঠিক আছে, ঠিক আছে। তাই হবে। আর হ্যাঁ, তুমি আমার খাবার দিতে বলো। ভীষণ খিদে পেয়েছে। আমি বরং হাত মুখটা একটু ধুয়ে আসি।

রানী : শোন শোন।

রাজা : আবার কী হলো, বলো।

রানী : আজ তোমার জন্য না তোমার পছন্দের খাবার রেঁধে রেখেছি, জানো?

রাজা ঃ কী তা শুনি।

রানী ঃ শুক্ত, কাতলা মাছের মুড়ো দিয়ে মুগের ডাল, মোচার ঘন্ট, গলদা চিংড়ির মালাইকারি আর আনারসের চাটনি। সঙ্গে তোমার প্রিয় মিষ্টি দই, চলবে তো?

রাজা : (পেটে হাত বোলাতে বোলাতে) উফ, শুনে খিদে যে আরও বেড়ে গেল রানী। যাও যাও নিয়ে এসো।

(রানীর প্রস্থান) (হাত নেড়ে)
(রাজার ওপর ফোকাস)

রাজা : না না না, কিছুতেই এমনি এমনি একটা পুরস্কার গোপালকে দেওয়া যাবে না। দেখি, কাল রাজসভায় গিয়ে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। (পেটে হাত দিয়ে) উফ, বড্ড খিদে পেয়ে গ্যাছে। বেশ কয়েকদিন পর গলদা চিংড়ি... আঃ, জমিয়ে খাওয়া যাবে।
(রানী ও রানী.... আরে আমার গা মোছাটা পাঠাও। *চিৎকার করে বলতে বলতে প্রস্থান*)

দৃশ্য ২

ঘোষণা ঃ মহামহীম, শ্রীযুক্ত, পরম শক্তিমান, দয়ালু, প্রজাবৎসল কৃষ্ণনগরের অধীশ্বর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রবেশ করছেন...। ধীরে ধীরে রাজকীয় ভঙ্গীতে সভায় ঢুকলেন রাজা। সকলে উঠে দাঁড়ালো। মন্ত্রী প্রণামের ভঙ্গীমায় গদগদ হয়ে দাঁড়িয়ে। ডানদিকে বড়ো একটা হাতপাখা নিয়ে প্রস্তুত প্রহরী। রাজা সিংহাসেন গিয়ে বসলেন। বসে সবাইকে বসতে বলার আগে সকলে সমস্বরে -- জয় হোক মহারাজের, জয় হোক, প্রণাম মহারাজ। (এরপর রাজা গম্ভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন।)

মন্ত্রী : কী হলো মহারাজ? আপনাকে এ্যাতো চিন্তিত লাগছে কেন? আপনার সাথে রানীমার কি কোনও ঝামেলা টামেলা হয়েছে, নাকি? নাকি অন্য কছু, মানে মাথা ব্যথা, শুল বেদনা বা পেট খারাপ ...

রাজা : (জোরে ধমক দিয়ে) আঃ মন্ত্রী ... তুমি সবাইকে নিজের সাথে গুলিয়ে ফেলো ক্যানো বলত? কাজে কম্মে তো অষ্টরম্ভা। সমস্যা যদি হয়েও থাকে, তাতে তোমাকে বলে লাভ? তুমি তো সেটা আরও বাড়িয়ে দেবে।
(মন্ত্রীর মুখ কাচুমাচু, নিচের দিকে মাথা হেঁট)
একটু থেমে রাজা বললেন— (সভা সদদের দিকে তাকিয়ে)

রাজা : একি, গোপাল কোথায়? আমাদের রত্ন?
(এবার আবার মন্ত্রী মুখ তুলে বললেন)

মন্ত্রী : জানেনই তো মহারাজ, গোপালের তো রাজসভা আসার কোনও সময়জ্ঞানই নেই। বার বার বলি, আপনি ব্যবস্থাই তো নেন না। আপনার আস্কারা পেয়ে পেয়েই তো গোপাল...

মন্ত্রী : আঃ, নালিশ করা স্বভাবটা ত্যাগ করো দেখি।

কবি : নালিশ করা মন্দ ভীষণ, বালিশ নিয়ে বসো,
পালিশ খেলে বুঝবে তখন, বুড়ো আঙুল চোসো।

ঋণ স্বীকার ঃ সফটটুনস

ক্রমশ